ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে

আহসান মোহাম্মদ

মাত্র এক যুগ আগেও ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলোতে যারা পড়তো তাদের সংখ্যা ছিল যেমন কম, তেমনি তাদের প্রায় সকলেই বিদেশে পাড়ি জমাতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আর পড়াশোনার পর সেখানেই থেকে যেতো। ফলে, তারা কি পড়তো না পড়তো, কিভাবে পড়তো ইত্যাদি নিয়ে সাধারণের তেমন মাথা ব্যাথা ছিল না। কিন্তু বিগত এক যুগে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে একদিকে শিক্ষার মানের ধ্বস নেমেছে, তেমনি রাজধানীতে হাতে গোনা কয়েকটি ভালো স্কুল থাকলেও মহানগরীর জনসংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধির কারণে সেগুলোতে ভর্তি হয়ে পড়েছে রীতিমত যুদ্ধ জয়ের মত। অপরদিকে বেসরকারী খাতে চাকুরীর সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে ইংরাজীর সুস্পষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। এদিকে মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা তাদের সন্তানের লেখাপড়ার জন্য মোটা অংক খরচ করতে পারছে। সব মিলিয়ে এখন রাজধানীর মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্তের খুব কম সদস্যই পাওয়া যাবে যাদের সন্তান বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ছে। কেবল রাজধানীতেই এখন লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করছে। যদিও এ সংখ্যা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যার তুলনায় তিনশত ভাগের এক ভাগেরও কম, কিন্তু আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এরা দখল করতে যাচ্ছে। ইংরাজী মাধ্যমে যারা পড়াশোনা করছে তারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছল শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি। তাদের শিক্ষার পিছনে তাদের পরিবার থেকে যত বেশী বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার খুব কমই পাচ্ছে বাকী শিক্ষার্থীরা। ফলে উচ্চ শিক্ষা কিংবা চাকুরী - সকল ক্ষেত্রেই তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে। এদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, বহুজাতিক কোম্পানী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এমনকি সরকারী আমলাদের একটি বিরাট অংশ তৈরী হবে। ফলে তাদের শিক্ষার মান, মনন গঠন, শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ইত্যাদির প্রতি উদাসীনতা জাতির জন্য ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

বর্তমানে ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলো চলছে রাষ্ট্রের কোন ধরণের সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। রাজধানীর আবাসিক এলাকাতে অপরিকল্পিতভাবে এসকল স্কুলের অধিকাংশ গড়ে উঠেছে। স্কুলগুলোর কারিকুলামের ক্ষেত্রে সরকারের না আছে কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণ কিংবা দিকনির্দেশনা, না আছে তাদের নিজেদের মধ্যে কোন ধরণের সমন্বয়। এক এক স্কুল এক এক বই পড়ানো হয়। তাদের বিষয়বস্তুও আবার ভিন্ন ভিন্ন। এক স্কুল যা পড়াচ্ছে ক্লাস ওয়ানে, আরেক স্কুল হয়তো তা পড়াচ্ছে ক্লাস ত্রিতে। অধিকাংশ বই লিখিত ভারতীয়দের দ্বারা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভারতের ইতিহাস, ভুগোল ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানছে, অথচ নিজের দেশের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকছে। তৃতীয় শ্রেণীর একটি শিশুকে পড়তে হচ্ছে ভারতের খনিজ সম্পদ, জলবায়ু ও ভুগোল সম্পর্কে। এমনিতেই ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিরোধহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাত্যাভিমান হুমকীর মুখে, তার উপর সমাজের উপর তলার শিশুদেরকে কচি মনে ভিন দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভুগোল গেঁথে দিয়ে তাদেরকে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাহীন একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করা হচ্ছে।

এই সকল বই-পত্র শুধু যে বাংলাদেশের সম্পর্কে পুরোপুরি নীরব তাই নয়, বরং সেগুলোতে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্ম বিশ্বাস নিয়েও চরম আপত্তিকরভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে। যেমন মাস্টারমাইন্ড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ানো হয় ইতিহাসের বই 'নিউ চিলড্রেন ইলাসট্রেটেড হিসট্রি'। ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এমন ১৪ জন মহামানবের জীবনের উপর বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তাঁর মৃত্যুর পর অনুসারীরা তাঁর শিক্ষাগুলোকে কোরান নামে একটি বইতে লিখে রাখেন।' (Muhammad dies in 632. The teachings of Muhammad were later written down by his followers in a book called Koran)। অর্থাৎ, কোরান মুহাম্মদ (সঃ) এর শিক্ষার সংকলন, আল্লাহর বাণী নয়। একই অধ্যায়ে কাবা শরীফ ও হযরে আসওয়াদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা শিউরে ওঠার মত। বলা হয়েছে, 'মক্কার কেন্দ্রে একটি মহান কালো পাথর ছিল যাকে আরবরা অত্যন্ত পবিত্র ভাবতো। কুরাইশ গোত্রের লোকেদের দায়িত্ব ছিল পাথরটিকে দেখাশোনা করা এবং যে কোন ধরণের ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করা'। (In the centre of Mecca was a great black stone which the Arabs thought was extremely holly. People of the Quraysh tribe were expected to look after the stone and guard it from any harm)। একটু পরে এই কালো পাথর (হযরে আসওয়াদ) কে একটি মূর্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা বিজয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'যখন তাঁরা (মুহাম্মদ সঃ ও তাঁর অনুসারীরা) যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করলেন, তখন তিনি ও তাঁর লোকেরা মক্কা আক্রমণ করলেন। তাঁরা শীঘ্রই শহরটি জয় করলেন এবং কালো পাথরটি ছাড়া অন্য সকল সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। (When they were strong enough, he and his men attacked Mecca. They soon conquered the city and broke all the idols except the black stone)। পাঠক লক্ষ্য করুন কিভাবে সুকৌশলে হযরে আসওয়াদকে মূর্তি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং আমাদের কোমলমতি শিশুদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে রসুল (সঃ) নিজে মূতির্কে সম্মান করতেন। বইটিতে ১৪ জন মহামানবের সারিতে রাখা হয়েছে শিবাজীর মত দস্যুকে এবং তার দস্যুতা ও মুসলিম সেনাপতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর বীরত্বগাথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে কিছু কিছু বই বাংলাদেশে লেখার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ধরণের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ভিত্তিতেই এই সকল বইগুলোকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্কুলগুলোর কোন ধরণের নূন্যতম যোগ্যতার মাপকাঠি নেই।

ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলোর একটি মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছে স্কুলের পরিবেশ। অধিকাংশ স্কুলই চলছে আবাসিক ভবন ভাড়া নিয়ে চলছে। তাতে না আছে খেলাধুলার স্থান আর না আছে আগুন ও ভূমিকম্পের মত দুর্ঘটনা মোকাবেলার কোন ব্যবস্থা। কোন স্কুলে আগুন ধরলে বা ভূমিকম্প হলে ছয়তলা স্কুলের কয়েক হাজার শিশু সরু সিড়ি দিয়ে নামতে গেলে বড় রকমের হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে অভিভাবকদের সবথেকে বেশী অভিযোগ লাগামহীন ফি বৃদ্ধি নিয়ে। স্কুল মালিকেরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে টাকা তৈরীর কারখানার বেশী কিছু হিসাবে দেখতে পারছেন না। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার মুখোমুখি হলে তারা তাদের এ মনোভাবের কথা গোপন রাখারও দরকার মনে করেন নি। স্কলাসটিকা স্কুলের প্রিন্সিপাল ও সাবেক উপদেষ্টা ইয়াসমিন মোর্শেদ কোন রাখঢাক না

রেখেই বলেছিলেন, 'প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো যদি মাত্রারিক্ত লাভ করলে দোষ না হয় তাহলে স্কুলগুলোর দোষ হবে কেন।' স্কুলগুলোর এই সীমাহীন লাভের প্রতিযোগিতাকে অভিভাবকদের অনেকেই আর্থিক নির্যাতনের সমতূল্য মনে করেন। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ভর্তি ফি অর্ধ লক্ষ টাকা। বাৎসরিক ফি ১২-১৫ হাজার টাকা। মাসিক টিউশন ফি ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত। এ ছাড়া রয়েছে ক্লাস পার্টি, পিকনিক পার্টি ইত্যাদির চাঁদা। বই-খাতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্কুল থেকেই চড়া দামে কিনতে হয়। কোন কোন স্কুল আবার বিভিন্ন অযুহাতে এক কালীন ডোনেশন নিয়ে থাকে। অভিভাবকগণ বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়ে এ সকল আর্থিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গেছেন এমনকি আইনী লড়াইও চালাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাদের সন্তানকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া ছাড়া আর কোন ফল হয় নি। সরকার এ সকল ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন।

ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষার বিভিন্ন দুর্বলতা ও দুরাবস্থাগুলো দূর করার জন্য বিগত সরকার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তখন তিনটি কমিটি তৈরী করা হয় যাদের উদ্দেশ্য ছিল ক. ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলোকে একটি আইনী কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, খ. তাদের কারিকুলাম পর্যালোচনা করা এবং গ. শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির নূন্যতম মানদন্ড নির্ধারণ করা। কমিটি তিনটি গত বছর তাদের রিপোর্টের খসড়া জমাও দিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের জন্য সে সুপারিশ আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল বলে খবর বেরিয়েছিল। তৎকালীন সরকার ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করার পরিকল্পনার কথাও সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিল। এই সকল স্কুলগুলোর জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড তৈরীর উদ্যোগের কথাও তখন জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল এই বোর্ডের কাজ হবে, সকল ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের জন্য অভিন্ন কারিকুলাম তৈরী, শিক্ষকদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ এবং টিউশন ফির সীমা নির্ধারণ। শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য স্কুলের খেলার মাঠ, লাইব্রেরীর মত অন্যান্য যেসব সুবিধা প্রয়োজন তার দিকেও বোর্ড দৃষ্টি রাখবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপর সরকার তার মেয়াদের শেষ দিকে চলে গেলে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয় নি।

শিক্ষাবিদগণের একাংশ অবশ্য ভিন্ন পাঠ্যক্রম ও ভিন্ন ধারার স্কুলের ধারণারই বিরোধী। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে বাংলা মাধ্যম, ইংরাজী মাধ্যম ও মাদ্রাসা - এই তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠছে। ইংরাজী মাধ্যমের খরচ অনেক বেশী হওয়ায় সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাতে ভর্তি হতে পারছে এবং বাকী বিশাল জনগোষ্ঠী তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে এ মতটি কতটুকু বাস্তবসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সরকারী স্কুলগুলো রাজধানীর সকল শিশুর জন্য মান সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছে না। যে সকল স্কুল ভালো বলে নাম করেছে, সেগুলিতেও রয়েছে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসা ও প্রতিযোগিতা। কোন ভালো স্কুলে ভর্তি হতে গেলে সেই স্কুলের কোন শিক্ষকের নিকট অন্ততঃ বছর খানেক ধরে প্রাইভেট পড়তে হবে। অল্প কয়েকটি সিটের বিপরীতে এতো বিপুল সংখ্যক শিশুকে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় যে ভর্তি ফরম যোগাড় করতে গিয়ে পদদলিত হয়ে আহত হবার মত ঘটনা ঘটে। ভর্তি পরীক্ষাও আবার এতো মান সমৃদ্ধ যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হয় তা পঞ্চম শ্রেণীর মানের। শিক্ষা নিয়ে সব থেকে বেশী বাণিজ্য ও রসিকতা হচ্ছে এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে।

দেখা যাচ্ছে মান সম্মত ও সযত্ন শিক্ষার যে বড় অভাব রয়েছে সে বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। সে অভাব পূরণ করতে কেউ এগিয়ে গেলে এবং অভিভাবকগণ সেদিকে ছুটলে কোন পক্ষেরই দোষ দেয়া

যায় না। এদিকে বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার প্রচলন যেভাবে বেড়ে চলেছে এবং তার বিপরীতে বাংলা মাধ্যমে ভাষাটি যেভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে, তাতে দেশের মধ্যে ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে দেশের বেসরকারী খাতের উচ্চ বেতনের চাকুরীগুলোর পুরোটাই পার্শ্ববর্তী দেশের নাগরিকদের হাতে চলে যাবে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের উপেক্ষার কারণে ইতোমধ্যে কয়েক লক্ষ ভারতীয় বাংলাদেশে বড় বড় পদে বৈধ ও অবৈধ ভাবে চাকুরী করে যাচ্ছে।

ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষার যে ধারাটি চালু হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার অবদান ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই এবং তাকে বাধাগ্রস্থ করাও সমীচীন হবে না। তবে, স্কুলগুলোর পড়াশোনার পরিবেশ ও মান নিশ্চিত করা এবং অভিভাবকদের উপর থেকে আর্থিক নির্যাতন প্রশমনে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বিগত সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা বাতিল না করে পুনরায় সচল করলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।